بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৭ ডিসেম্বর, ২০২১ মোতাবেক ১৭ ফাতাহ্, ১৪০০ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হযরত আবু বকর (রা.)'র স্মৃতিচারণে তাঁর ক্রীতদাস মুক্ত করা সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। এ সম্পর্কে আরও কিছু ঘটনা রয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.) নাহদীয়া এবং তার মেয়ে উভয়কে মুক্ত করিয়েছেন। তারা উভয়ে বনূ আব্দুদ্ দ্বার (গোত্রের) এক মহিলার দাসী ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাদের উভয়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাদের মালিক তাদেরকে আটা ভাঙ্গানোর জন্য পাঠিয়েছিল আর সে বলছিল, আল্লাহ্‌র কসম বা অন্য কারো নামে কসম খাচ্ছিল যে, আমি তোমাদের কখনও মুক্ত করবো না। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে অমুকের মা! নিজের শপথ ভেঙ্গে ফেল। সে বলে, যাও, যাও। তুমিই তো এদের নষ্ট করেছ। তোমার যদি এতই দরদ থাকে তাহলে তুমি এদের উভয়কে মুক্ত করিয়ে নাও। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, এদের উভয়ের বিনিময়-মূল্য কত দিতে হবে? সে বলে, এই পরিমাণ এবং এই পরিমাণ (অর্থ)। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি তাদের উভয়কে (কিনে) নিলাম এবং (এখন) এরা দু'জন স্বাধীন। এরপর তিনি (রা.) তাদেরকে বলেন, ঐ মহিলার আটা ফিরিয়ে দাও, অর্থাৎ যাদের দাসী বানানো হয়েছিল তাদেরকে বলেন, এই মহিলার আটা ফিরিয়ে দাও, যা (তারা) ভাঙ্গানোর জন্য নিয়ে যাচ্ছিল। তারা উভয়ে বলেন, হে আবু বকর (রা.)! আমরা এই কাজ সমাধা করে তারপর আটা ফিরিয়ে দিয়ে আসি? অর্থাৎ, আমাদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, তা শেষ করে নেই এবং আটা ভাঙ্গিয়ে দিয়ে আসি? হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, ঠিক আছে। যদি তোমরা চাও তাহলে এরূপই করো।

হযরত আবু বকর (রা.) একদা বনূ মু'আম্মল (গোত্রের) এক দাসীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। বনূ মু'আম্মল ছিল বনূ আদী বিন কা'ব এর একটি গোত্র। সেই দাসী মুসলমান ছিলেন। উমর বিন খাত্তাব (রা.) তাকে কষ্ট দিচ্ছিলেন, যাতে তিনি ইসলাম পরিত্যাগ করেন। হযরত উমর (রা.) তখনও মুশরিক ছিলেন, ইসলাম গ্রহণ করেন নি। তিনি (সেই দাসীকে) মারধোর করতেন (আর মারতে মারতে) ক্লান্ত হয়ে গেলে তিনি বলতেন, আমি শুধুমাত্র ক্লান্ত হয়ে পড়ার কারণে তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। তখন সেই (দাসী) বলতেন, তোমার সাথেও আল্লাহ্ এমনটিই করবেন। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) তাকেও ক্রয় করে মুক্ত করে দেন।

একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত আবু বকর (রা.)'র পিতা আবু কোহাফা তাঁকে বলেন, হে আমার পুত্র! আমি দেখছি যে, তুমি দুর্বল লোকদের মুক্ত করাচ্ছ। তুমি যদি এটিই করতে চাও তাহলে শক্তিশালী পুরুষদের মুক্ত করাও, যাতে তারা তোমার নিরাপত্তা বিধান করতে পারে

এবং তারা তোমার সাহায্যে দণ্ডায়মান হয়। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে আমার প্রিয় পিতা! আমি তো শুধুমাত্র মহাপ্রতাপান্বিত ও সম্মানিত আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করি।

অতএব, কোন কোন তফসীরকারক (যেমন) আল্লামা কুরতুবী এবং আল্লামা আলুসী প্রমুখ বলেন, হযরত আবু বকর (রা.)'র এরূপ কর্মকাণ্ডের ফলেই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন।

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴿﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿﴾ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿﴾
وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴿﴾ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ﴿﴾ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴿﴾ وَإِنَّ لَنَا
لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ﴿﴾ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴿﴾ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿﴾ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿﴾ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى
﴿﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ﴿﴾ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ ﴿﴾ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ﴿﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ
﴿﴾ (সূরা আল্ লায়লঃ ৬-২২)

অতএব, যে (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) দান করেছে ও তাকওয়া অবলম্বন করেছে এবং সর্বোত্তম পুণ্যের সত্যায়ন করেছে আমরা অবশ্যই তাকে স্বাচ্ছন্দ্য দান করব। কিন্তু যে কৃপণতা করেছে ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে এবং যে উত্তম বিষয়কে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে সেক্ষেত্রে আমরা অচিরেই তাকে দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত করে দিব। আর সে যখন ধ্বংস হবে তখন তার ধনসম্পদ তার কোন উপকারে আসবে না। নিশ্চয় হিদায়াত দেয়া আমাদের জন্য আবশ্যক এবং নিশ্চয় পরকাল ও ইহকাল আমাদেরই আয়ত্তাধীন। অতএব, আমি তোমাদেরকে এক জ্বলন্ত অগ্নি সম্বন্ধে সতর্ক করে দিলাম। চরম হতভাগা ছাড়া কেউই তাতে প্রবেশ করবে না (অর্থাৎ) যে (স্পষ্ট সত্যকে) মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে। তবে পরম মুত্তাকীকে অবশ্যই তা হতে দূরে রাখা হবে যে আত্মশুদ্ধি লাভের জন্য নিজ সম্পদ ব্যয় করে। আর তার প্রতি কারো এমন কোন অনুগ্রহ নেই যার বিনিময় তাকে দিতে হয়। বরং তার সর্বমহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভই তার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর তিনি অবশ্যই (তার প্রতি) সন্তুষ্ট হবেন।

হযরত আবু বকর (রা.) যেসব ক্রীতদাসকে মুক্ত করেছিলেন হযরত খাব্বাব বিন আরত (রা.)ও তাদের একজন ছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত খাব্বাব বিন আরত (রা.)'র উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, অপর এক সাহাবী যিনি প্রথমে ক্রীতদাস ছিলেন, তিনি একবার গোসল করার জন্য জামা খুলেন তখন পাশেই আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিল। সেই ব্যক্তি দেখে যে, তার পিঠের ওপরের অংশের চামড়া খুবই শক্ত ও খসখসে যেমনটি মহিষের চামড়া হয়ে থাকে। সেই ব্যক্তি এটি দেখে অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে, তোমার এই রোগ কবে থেকে হল? তোমার পিঠের চামড়া তো পশুর চামড়ার মত। একথা শুনে তিনি হেসে ওঠেন এবং বলেন, এটি কোন রোগ নয়। আমরা যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করি তখন আমাদের মনিব আমাদেরকে শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর প্রচণ্ড রোদে আমাদেরকে শুইয়ে দিয়ে প্রহার

করতে আরম্ভ করতো এবং বলতো, তোমরা বল 'মুহাম্মদ (সা.)-কে আমরা মানি না'। আমরা কলেমা শাহাদত পড়ে এর উত্তর দিতাম। এরপর সে আবার আমাদেরকে মারতে আরম্ভ করতো। এভাবেও যখন তার রাগ প্রশমিত হতো না তখন আমাদেরকে পাথরের ওপর দিয়ে টানা-হেঁচড়া করা হতো। তিনি (রা.) লিখেন, আরবে কাঁচা বা মাটির ঘরগুলোকে পানির (প্রকোপ) থেকে রক্ষা করার জন্য বাড়ির পাশে এক ধরনের পাথর ফেলা হতো যাকে পাঞ্জাবিতে 'খিংগার' বলে। এই পাথর খুবই খরখরে ও চোখা হয়ে থাকে এবং লোকেরা এ পাথর প্রাচীরের গায়েও লাগাতো যেন পানি বেয়ে পড়লেও দেয়ালের ক্ষতি না হয়। যাহোক, সেই সাহাবী বলেন, আমরা যখন ইসলাম পরিত্যাগ করতাম না তখন লোকেরা আমাদেরকে মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে যেত, এরপর আমাদের পায়ে রশি বেঁধে এই খরখরে ও ধারালো পাথরের ওপর দিয়ে টানাহেঁচড়া করা হতো। বস্তুত তুমি এখন যা দেখছ তা সেই মারধোর ও ছেচড়ানোরই ফল। মোটকথা, বছরের পর বছর তাদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়। অবশেষে হযরত আবু বকর (রা.) এটি আর সহ্য করতে না পেরে নিজের সম্পত্তির বৃহদাংশ বিক্রি করে তাকে মুক্ত করিয়ে দেন।

হযরত আবু বকর (রা.)'র দাসমুক্তির উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, এসব ক্রীতদাস যারা মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছিল তারা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির লোক ছিল। তাদের মধ্যে হাবশীও ছিল যেমন বেলাল (রা.), রোমানও ছিল যেমন সুহায়েব (রা.), এছাড়া এদের মাঝে খ্রিস্টানও ছিল যেমন হযরত জুবায়ের ও সুহায়েব (রা.) এবং এদের মাঝে মুশরিকও ছিলেন, যেমন বেলাল ও আম্মার। বেলাল (রা.)'র মনিব তাঁকে তপ্ত বালুতে শুইয়ে দিয়ে তার ওপর হয় পাথর চাপিয়ে দিত কিংবা কিশোরদেরকে তার বুকে লাফানোর জন্য নিযুক্ত করে দিত। হযরত আবু বকর (রা.) যখন তার ওপর এহেন নির্যাতন হতে দেখেন তখন তিনি তার মনিবকে মুক্তিপণ দিয়ে তাকে মুক্ত করে দেন।

হযরত আবু বকর (রা.) একবার ইথিওপিয়ায় হিজরতের ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, মুসলমানদের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পায় এবং ইসলাম প্রকাশিত হয় তখন কুরাইশ কাফিররা তাদের মধ্য থেকে নিজ নিজ গোত্রের ঈমান আনয়নকারীদের ওপর নির্মম অত্যাচার ও নির্যাতন করতে লাগল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে মুরতাদ বানানো। তখন মহানবী (সা.) মু'মিনদেরকে বলেন, তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে একত্রিত করে দিবেন। সাহাবীরা নিবেদন করেন, আমরা কোথায় যাব? তিনি (সা.) বলেন, ঐদিকে আর মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে এগারোজন পুরুষ এবং চারজন মহিলা হাবশা বা ইথিওপিয়া অভিমুখে হিজরত করেন। মুসলমানরা হাবশার দিকে হিজরত করার পরে হযরত আবু বকর (রা.)-কেও কষ্ট দেয়া হয়। তাই তিনি হাবশার উদ্দেশ্যে হিজরতের ইচ্ছা পোষণ করেন। অতএব, এ বিষয়ে বুখারীর রেওয়ায়েত হল, হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, যখন মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয়া হয় তখন হযরত আবু বকর (রা.) হিজরত করার উদ্দেশ্যে হাবশা অভিমুখে যাত্রা করেন। যখন তিনি মক্কা থেকে পাঁচ রাতের দুরত্বে সমুদ্র তীরবর্তী স্থানে অবস্থিত ইয়েমেনের **বারকুর রিমাদ** শহরে পৌঁছেন সেখানে ইবনে দাগিনার সাথে সাক্ষাৎ হয়, যে কারা

গোত্রের সর্দার ছিল। সে জিজ্ঞেস করে, হে আবু বকর! কোথায় যাচ্ছ? হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমার জাতি আমাকে বের করে দিয়েছে আর আমি চাই ভূপৃষ্ঠে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে আমার প্রভুর ইবাদত করতে। ইবনে দাগিনা বলল, তোমার মতো মানুষ নিজ থেকে তো দেশ থেকে বের হওয়ার কথা না এবং তাকে বহিস্কার করাও উচিত না। তুমি তো সেসব পুণ্যকর্ম কর যা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে আর তুমি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা কর, দুর্বলদের বোঝা বহন কর, অতিথি আপায়্যন কর এবং বিপদক্লিষ্টদের সাহায্য কর। একস্থানে এভাবে অনুবাদ করা হয়েছে যে, তুমি নিঃস্ব বা কাঙ্গালদের জীবিকার ব্যবস্থা কর, আত্মীয়দের সাথে উত্তম আচরণ কর, অসহায়দের আশ্রয় দাও, অতিথিপরায়ণ এবং প্রকৃত অর্থে সমস্যাকবলিতদের সাহায্য কর। এরপর সে বলে, আমি তোমাকে নিরাপত্তা দিচ্ছি। ফিরে চল এবং নিজ দেশেই স্বীয় প্রভুর ইবাদত কর। অতএব, ইবনে দাগিনাও হযরত আবু বকর (রা.)'র সাথে মক্কায় আসে এবং কুরাইশের কাফির সর্দারের সাথে সাক্ষাত করে তাদেরকে বলল, আবু বকর এমন ব্যক্তি যে তার মত মানুষ দেশ থেকে বের হয় না আর তাকে দেশান্তরিত করাও যায় না। তোমরা কি এমন ব্যক্তিকে দেশ থেকে বহিস্কার করছে যে এমন সব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যা আজকাল বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর সে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী, দুর্বলদের বোঝা বহনকারী, অতিথিপরায়ণ এবং বিপদক্লিষ্টদের সাহায্যকারী। তখন কুরাইশরা ইবনে দাগিনার নিরাপত্তা প্রদান মেনে নেয় এবং হযরত আবু বকর (রা.)-কে নিরাপত্তা দেয় আর ইবনে দাগিনাকে বলে, আবু বকরকে বলে দাও! সে যেন তার প্রভুর ইবাদত নিজ ঘরে বসেই করে এবং সেখানেই নামায পড়বে আর যা চাইবে পাঠ করবে। কিন্ত আমাদেরকে যেন নিজের ইবাদত এবং কুরআন পাঠের মাধ্যমে কষ্ট না দেয় এবং উঁচু আওয়াজে না পাঠ করে কেননা, আমাদের ভয় হয়, পাছে আমাদের ছেলে-মেয়ে, স্ত্রীদের আবার পথভ্রষ্ট না করে ফেলে। ইবনে দাগিনা আবু বকর (রা.)-কে এগুলো বলে দিল। তখন হযরত আবু বকর (রা.) নিজের বাড়িতেই স্বীয় প্রভুর ইবাদত করতে লাগলেন এবং নিজের বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও প্রকাশ্যে নামায আদায় এবং কুরআন তিলাওয়াত করতেন না। এর কিছু সময় পর হযরত আবু বকর (রা.)'র ভাবনায় পরিবর্তন আসে, তিনি তাঁর বাড়ির উঠানে একটি মসজিদ অর্থাৎ, নামায পড়ার স্থান বানিয়ে নেন এবং উন্মুক্ত স্থানে বের হন। সেখানে নামাযও পড়তেন এবং কুরআন তিলাওয়াতও করতেন। আর মুশরিক মহিলা এবং শিশুরা তার কাছে ভীড় জমাতো আর হযরত আবু বকর (রা.)-কে দেখে তারা আশ্চার্যান্বিত হত এবং দেখতো যে, তিনি খুবই ক্রন্দনশীল মানুষ। যখন কুরআন তিলাওয়াত করতেন তখন অশ্রু ধরে রাখতে পারতেন না। এই পরিস্থিতি কুরাইশের মুশরিক নেতাদেরকে চিন্তিত করে তোলে এবং তারা ইবনে দাগিনাকে ডেকে আনে। সে তাদের কাছে আসলে তারা তাকে বলল, আমরা তো আবু বকরকে এই শর্তে নিরাপত্তা দিয়েছিলাম যে, সে নিজ ঘরে তাঁর প্রভুর ইবাদত করবে, কিন্তু তিনি এই শর্তের সম্মান রক্ষা করেনি এবং নিজ বাড়ির উঠানে মসজিদ বানিয়েছে এবং প্রকাশ্যে নামায ও কুরআন তিলাওয়াত শুরু করেছে। তিনি আমাদের শিশু ও নারীদের পরীক্ষায় ফেলবেন বলে আমাদের শংকা হয়। তুমি তাঁর কাছে যাও। তিনি যদি নিজের ঘরের ভেতরে থেকে তাঁর প্রভুর

ইবাদত করতে পছন্দ করেন তাহলে তা করতে পারেন, নতুবা তিনি যদি প্রকাশ্যে ইবাদত করার ক্ষেত্রে অটল থাকেন তাহলে তাঁকে বল, সে যেন তোমার দেয়া নিরাপত্তা তোমাকে ফিরিয়ে দেয়। কেননা, এটি আমাদের পছন্দ নয় যে, তোমার দেয়া নিরাপত্তা লঙ্ঘন করবে। আবু বকরকে আমরা কখনও প্রকাশ্যে ইবাদত করতে দিব না। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, ইবনে দাগেনা হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছে আসে এবং বলে, আপনি সেই শর্তের কথা জানেন যার প্রেক্ষিতে আমি আপনাকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। তাই হয় আপনি উক্ত প্রতিশ্রুতির গণ্ডিতে সীমাাবদ্ধ থাকুন নতুবা আমার দেয়া নিরাপত্তা (আমাকে) ফিরিয়ে দিন, কেননা আমি চাই না, আরবরা এই কথা শুনবে যে, আমি যে ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়েছিলাম তার সাথে আমি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছি। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি তোমার দেয়া আশ্রয় তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি আর আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়েই সন্তুষ্ট। হযরত আবু বকর (রা.) নিজের উঠানে যে মসজিদ বানিয়েছিলেন সেটি সম্পর্কে সহীহ্ বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ **উমদাতুল ক্বারী'**তে লিখা আছে যে, এই মসজিদটি ঘরের দেয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল আর এটি ইসলাম ধর্মে নির্মিত প্রথম মসজিদ ছিল।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, আবু বকর (রা.)'র ন্যায় মানুষ, পুরো মক্কা যার অনুগ্রহের কাছে ঋণী ছিল, তিনি যা কিছু উপার্জন করতেন তা দাস মুক্ত করার পেছনে ব্যয় করতেন। তিনি একদা মক্কা ছেড়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় পথিমধ্যে এক নেতার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। আর সে জিজ্ঞেস করে, হে আবু বকর! তুমি কোথায় যাচ্ছ? তিনি বলেন, এই শহরে এখন আর আমার জন্য নিরাপত্তা নেই। আমি এখন অন্য কোথাও চলে যাচ্ছি। সেই নেতা বলে, তোমার মতো পুণ্যবান মানুষ যদি শহর ছেড়ে চলে যায় তাহলে এই শহর ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি তোমাকে আশ্রয় প্রদান করছি, তুমি শহর ছেড়ে যেও না। তিনি সেই নেতার আশ্রয়ে শহরে ফিরে আসেন। তিনি যখন সকালে উঠতেন আর কুরআন পাঠ করতেন তখন নারী ও শিশুরা দেয়ালের সাথে কান পেতে কুরআন শুনতো, কেননা তার কণ্ঠে ছিল পরম কোমল, মর্মস্পশী ও বেদনাঘন। পবিত্র কুরআন যেহেতু আরবী ভাষায় ছিল তাই সকল নারী, পুরুষ ও শিশুরা এর অর্থ বুঝতে পারত এবং শ্রোতারা এতে প্রভাবিত হতো। একথা যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন মক্কায় এই হৈচৈ আরম্ভ হয় যে, এভাবে তো সবাই ধর্মচ্যুত হয়ে যাবে। অর্থাৎ পবিত্র কুরআন শুনে এবং তাঁর বিগলিত কণ্ঠ শুনে মানুষ ধর্মচ্যুত হয়ে যাবে।

একই অবস্থা আজকাল আহমদীদের সাথে কতিপয় দেশে হচ্ছে, বিশেষত পাকিস্তানে। অর্থাৎ যদি আহমদীদেরকে কুরআন পাঠ করতে বা নামায পড়তে কেউ দেখে ফেলে তাহলে তারা ধর্মচ্যুত হয়ে যাবে। তাই আহমদীদের জন্য নামায এবং কুরআন পাঠের ক্ষেত্রে খুবই কঠোর শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে।

যাহোক, তিনি (রা.) বলেন, অবশেষে মানুষ সেই নেতার কাছে যায় এবং তাকে বলে, তুমি তাকে কেন আশ্রয় দিয়ে রেখেছ? সেই নেতা এসে হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলে, আপনি এভাবে (প্রকাশ্যে) কুরআন পাঠ করবেন না। মক্কার লোকেরা এতে অসন্তুষ্ট হয়। হযরত আবু

বকর (রা.) বলেন, তাহলে তুমি তোমার আশ্রয় ফিরিয়ে নাও। আমি এটি থেকে বিরত থাকতে পারব না। অতএব, সেই নেতা নিজ নিরাপত্তা ফিরিয়ে নেয়।

শে'বে আবী তালিব-এ-ও হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন। মক্কার কুরাইশরা একত্ববাদের বাণীকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য সম্ভাব্য সকল চেষ্টা করে। কিন্তু যখন তারা সকল দিক থেকে ব্যর্থ হয় তখন তারা একটি ব্যবহারিক পদক্ষেপ হিসেবে বনূ হাশেম ও বনূ মুত্তালিব এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সম্পর্কে সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে লিখেন যে,

কুরাইশরা একটি ব্যবহারিক পদক্ষেপ হিসেবে পরস্পর পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, মহানবী (সা.) এবং বনূ হাশেম ও বনূ মুত্তালিব গোত্রের সকল সদস্যের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করা হোক আর যদি তারা মহানবী (সা.)-কে নিরাপত্তা প্রদান করা থেকে বিরত না হয় তাহলে তাদেরকে একস্থানে অবরুদ্ধ করে ধ্বংস করা হোক। অতএব, সপ্তম নববী সনের মুহাররম মাসে রীতিমত একটি চুক্তিপত্র লেখা হয় যে, কোন ব্যক্তি বনূ হাশেম এবং বনূ মুত্তালিব গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখবে না। আর তাদের কাছে কেউ কিছু বিক্রিও করবে না, তাদের কাছ থেকে কিছু কিনবেও না। তাদের কাছে কোন খাদ্যসামগ্রী পৌঁছুতে দেবে না এবং তাদের সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছ থেকে পৃথক হয়ে তাঁকে (সা.) তাদের হাতে তুলে না দিবে। বর্তমানে কোন কোন স্থানে কতিপয় আহমদীর সাথে উক্ত ব্যবহারই করা হচ্ছে এই চুক্তি, যাতে কুরাইশদের সাথে বনূ কিনানাও অংশীদার ছিল, রীতিমতো লিপিবদ্ধ করা হয় এবং তাতে সকল বড় বড় নেতার স্বাক্ষর নেয়া হয়, এরপর সেটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় অঙ্গীকারনামা হিসেবে কা'বা গৃহরে দেয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। অতএব, মহানবী (সা.) এবং বনূ হাশেম ও বনূ মুত্তালিব গোত্রের সকল সদস্য, তা সে মুসলমান কিংবা কাফির, কেবল মহানবী (সা.)-এর চাচা আবু লাহাব ব্যতীত, যে কিনা চরম শত্রুতার কারণে কুরাইশদের সঙ্গ দিয়েছিল, শে'বে আবী তালিব-এ, যা একটি পাহাড়ী উপত্যকা ছিল, অবরুদ্ধ হয়ে যায়। আর এভাবে যেন কুরাইশদের বড় বড় দু'টি গোত্র মক্কার সামাজিক জীবনযাত্রা থেকে কার্যত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং শে'বে আবি তালিব-এ, যা বনূ হাশেম গোত্রের গোত্রীয় উপত্যকা বা গিরিপথ ছিল, কয়েদীদের ন্যায় নজরবন্দী হয়ে যায়। গুটিকতক অন্য মুসলমান, যারা সেসময় মক্কায় অবস্থান করছিল তারাও মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিল। এহেন কঠিন পরিস্থিতিতেও হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর সঙ্গ পরিত্যাগ করেন নি। অতএব, হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ্ (রাহে.) বলেন, কুরাইশরা যখন মহানবী (সা.)-কে কষ্ট দেয়ার বিষয়ে একমত হয় এবং তারা একটি চুক্তিপত্র লিখে, তখন হযরত সিদ্দীক (রা.) সেই কষ্টের যুগেও মহানবী (সা.)-এর সঙ্গী ছিলেন। এ দৃষ্টিকোন থেকে এ ঘটনা সম্পর্কে আবু তালিব এই পঙক্তি বলেন,

هم رجعوا سهل ابن بيضا راضيا

فسر ابو بكر بها و محمد

(উচ্চারণঃ হুম রাজাঊ সাহাল ইবনা বায়যাআ রাযিয়ান, ফা সুররা আবু বকরীন বিহা ওয়া মুহাম্মাদ) অর্থঃ আর তারা সাহ্‌ল বিন বায়যা'কে আনন্দিত করে ফেরত পাঠায় আর এতে আবু বকর (রা.) এবং মুহাম্মদ (সা.) আনন্দিত হন। অর্থাৎ, অবশেষে মক্কার কুরাইশরা যখন অবরোধ তুলে নেয় তখন আবু তালিব যে পঙক্তিসমূহ পাঠ করেছিলেন সেগুলোর মধ্যে উপরোল্লিখিত পংক্তিটি ছিল একটি। অর্থাৎ, বয়কট শেষ হওয়ায় মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) উভয়েই আনন্দিত হন।

غُلِبَتِ الرُّومُ-এর ভবিষ্যদ্বাণী এবং এতে হযরত আবু বকর (রা.)'র বাজি ধরা সম্পর্কেও বর্ণনা রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আল্লাহ্ তা'লার বাণী, الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ সম্পর্কে রেওয়ায়েত হল 'গুলিবাত' এবং 'গালাবাত'। তিনি বলেন, মুশরিকরা রোমানদের বিরুদ্ধে পারস্যবাসীদের বিজয় লাভ করা পছন্দ করতো, কেননা এরা এবং তারা মূর্তিপূজারী ছিল। আর মুসলমানরা পারস্যবাসীদের বিরুদ্ধে রোমানদের বিজয় লাভ করা পছন্দ করতো, কেননা তারা আহলে কিতাব ছিল। তারা এর উল্লেখ হযরত আবু বকর (রা.)র কাছে করে আর হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর নিকট এর উল্লেখ করলে তিনি (সা.) বলেন, তারা অবশ্যই বিজয় লাভ করবে। হযরত আবু বকর (রা.) যখন একথা তাদেরকে অর্থাৎ মুশরিকদের বলেন তখন তারা বলে, আমাদের এবং তোমাদের মাঝে একটি সময় নির্ধারণ করে নাও, অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদী ও মুশরিকদের সাথে। আমরা যদি বিজয় লাভ করি তাহলে আমাদের জন্য এটি এবং ওটি হবে। আর যদি তোমরা বিজয়ী হও তবে তোমাদের জন্য এটি এবং ওটি হবে, অর্থাৎ এই শর্তে বাজি ধরে। যাহোক, তারা পাঁচ বছর সময় নির্ধারণ করে, কিন্তু তারা (অর্থাৎ রোমানরা) বিজয় লাভ করতে পারে নি। তারা তখন মহানবী (সা.)-এর নিকট এর উল্লেখ করে। তিনি (সা.) বলেন, তোমরা আরও বেশি সময় কেন নির্ধারণ করো নি? বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তাঁর (সা.) কথার অর্থ ছিল ১০ বছর। এটি তিরমিযীর তফসীরের বর্ণনা।

সহীহ বুখারীর একটি রেওয়ায়েতে মহানবী (সা.)-এর এমন চারটি ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করা হয়েছে যা অত্যন্ত মহিমার সাথে পূর্ণ হয়েছে। এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর মাঝে রোমের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণীও রয়েছে। যেমন মাসরূক বর্ণনা করেন যে, আমরা আবদুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.)'র কাছে ছিলাম। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) যখন মানুষকে সত্যবিমুখ হতে দেখেন তখন তিনি বলেন, হে আল্লাহ্ যেভাবে ইউসুফ (আ.)-এর যুগে সাত বছর (দীর্ঘ) দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তাদের ওপরও তেমনই দুর্ভিক্ষ চাপাও। অতএব, তাদের ওপরও সেরূপ দুর্ভিক্ষ আসে যা সব কিছু ধ্বংস করে দেয়। এমনকি অবশেষে তারা চামড়া, মৃতপ্রাণী ও দুর্গন্ধযুক্ত মৃতদেহও ভক্ষণ করে। আর তাদের মাঝে কেউ আকাশের দিকে তাকালে ক্ষুধার কারণে চোখে অন্ধকার দেখতে পেতো। এটি সেই চারটি ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্য হতে একটি ঘটনা। (তখন) আবু সুফিয়ান মহানবী (সা.)-এর কাছে আসে এবং বলে, হে মুহাম্মদ (সা.) আপনি তো আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্য এবং আত্মীয়তার

সম্পর্ক রক্ষার নির্দেশ দিয়ে থাকেন, কিন্তু দেখুন! আপনার জাতি ধ্বংসের মুখে। আপনি আল্লাহ্‌র নিকট তাদের জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, অতএব তোমরা সেই দিনের অপেক্ষা কর যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধোঁয়া নিয়ে আসবে। নিশ্চয় তোমরা এই বিষয়গুলোরই পুনরাবৃত্তি করবে। যেদিন আমরা কঠোর পাকড়াও করব। অতএব, এই কঠোর পাকড়াও বদরের দিন হয়েছিল। অতএব, ধোঁয়ার শাস্তি এবং কঠোর পাকড়াও আর লেজামান বা পিছুধাওয়াকারী ভবিষ্যদ্বাণী এবং রোম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী- সবই পূর্ণ হয়েছে। এটি বুখারীর রেওয়ায়েত।

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদর উদ্দীন আইনী রোমের বিজয় সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন যে, যখন পারস্য এবং রোমান সম্রাজ্যের মাঝে যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন মুসলমানরা পারস্যের বিপক্ষে রোমানদের বিজয় চাচ্ছিল। কেননা, রোমানরা আহলে কিতাব ছিল, কিন্তু কুরাইশ কাফিররা পারস্যবাসীদের বিজয় চাচ্ছিল, কেননা তারা অগ্নি উপাসক ছিল আর কুরাইশরাও মূর্তিপূজা করতো। অতএব, এই বিষয়ে হযরত আবু বকর (রা.) এবং আবু জাহলের মাঝে বাজি ধরা হয়। অর্থাৎ, তারা কোন বিষয়ে পরস্পরের মাঝে কয়েক বছরের মিয়াদ নির্ধারণ করে নেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, **'বিযউন'** তো সাত বা নয় বছরের মেয়াদ হয়ে থাকে, তাই সময় বাড়িয়ে নাও- এখানে **'বিযউন'** শব্দ রয়েছে। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) তা-ই করেন। অতঃপর, রোমানরা বিজয়ী হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

الم ﴿٢﴾ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴿٣﴾ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿٤﴾ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ
مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥﴾ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦﴾

অর্থ হল, الم এর পূর্ণ বাক্য হলো আনাল্লাহু আ'লামু অর্থাৎ, আমি আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখি। রোমানদের নিকটবর্তী দেশে পরাস্ত করা হয়েছে এবং তারা তাদের পরাজয়ের পর পুনরায় অবশ্যই বিজয়ী হবে, তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে। পূর্বে ও পরে সিদ্ধান্ত আল্লাহ্‌রই চলে এবং সেদিন মু'মিনরাও নিজেদের বিজয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হবে, যা আল্লাহ্‌র সাহায্যে (লাভ) হবে। (সূরা আর্ রূমঃ ২-৬) আর শা'বী বলেন, তখন বাজি ধরা বিধিসম্মত ছিল।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এ সম্পর্কে লিখেন, ইসলামের পূর্বে এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে সমগ্র সভ্য পৃথিবীতে সবথেকে বেশি শক্তিশালী এবং সবার চেয়ে বেশি বিস্তৃত সাম্রাজ্য ছিল দু'টি। পারস্য সাম্রাজ্য এবং রোমান সাম্রাজ্য। আর এই উভয় সাম্রাজ্য আরবের নিকটেই অবস্থিত ছিল। পারস্য সাম্রাজ্য আরবের উত্তর-পূর্ব দিকে আর রোমান সাম্রাজ্য ছিল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। যেহেতু এই দু'ই সাম্রাজ্যের সীমানা পরস্পর লাগোয়া ছিল তাই অনেক ক্ষেত্রে উভয় সাম্রাজ্যের মাঝে পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহ লেগে যেত। সেই যুগের ঘটনা যখন এ উভয় সাম্রাজ্য পারস্পরিক যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, এটি সে যুগের কথা যখন উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল আর পারস্য সাম্রাজ্য রোমান সাম্রাজ্যকে পদানত করে রেখেছিল এবং তাদের (তথা রোমানদের) অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ছিনিয়ে নিয়েছিল এবং তাদেরকে অব্যাহতভাবে কোনঠাসা করতে থাকত। কুরাইশরা ছিল মূর্তিপূজারী এবং পারসীরা প্রায় একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী

ছিল। তাই মক্কার কুরাইশরা পারস্যের ঐসব বিজয়ে ছিল ভীষণ উৎফুল্ল। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের প্রতি মুসলমানদের সহমর্মিতা ছিল কেননা, রোমান সাম্রাজ্য ছিল খ্রিস্টান এবং খ্রিস্টানরা আহলে কিতাব হওয়ায় এবং হযরত মসীহ্ নাসেরীর সাথে সম্পর্ক থাকায় প্রতিমাপূজারী এবং অগ্নিপূজারী জাতির তুলনায় মুসলমানদের অনেক কাছের ছিল। এমতাবস্থায় মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে জ্ঞান লাভ করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এখন তো রোমানরা পারসীয়দের দ্বারা পরাভূত হচ্ছে কিন্তু আগামী কয়েক বছরের মধ্যে তারা পারস্যের ওপর বিজয় লাভ করবে আর সেদিন মু'মিনরা আনন্দিত হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনে মুসলমানরা, যাদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.)'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, মক্কায় সর্বসাধারণের মাঝে ঘোষণা দিতে আরম্ভ করেন যে, আমাদের খোদা জানিয়েছেন, **'অচিরেই রোমানরা পারস্যের ওপর বিজয় লাভ করবে'**। কুরাইশরা প্রত্যুত্তরে বলে, যদি এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হয়ে থাকে তাহলে চলো বাজি ধরি। তখনও যেহেতু ইসলামে বাজি ধরা নিষেধ ছিল না তাই হযরত আবু বকর (রা.) তাদের শর্ত মেনে নেন, ফলে কুরাইশ নেতৃবর্গ এবং হযরত আবু বকর (রা.)'র মাঝে জয়-পরাজয়ের বাজি হিসেবে কয়েকটি উট নির্ধারিত হয় এবং ছয় বছরের মিয়াদকাল নির্ধারিত হয়। কিন্তু মহানবী (সা.) যখন এ বিষয়ে জানতে পারেন তখন তিনি (সা.) বলেন, ছয় বছর সময় নির্ধারণ করা ভুল। আল্লাহ্ তা'লা সময়সীমা সম্পর্কে بِضْعِ سِنِينَ শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং আরবী বাগধারায় এই শব্দদ্বয় তিন থেকে নয়-এর জন্য বলা হয়ে থাকে। এই (বাজি ধরার) ঘটনা সেই যুগের, যখন মহানবী (সা.) মক্কাতেই অবস্থান করছিলেন অর্থাৎ, তখনও হিজরত করা হয় নি। এই নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই (তথা নয় বছরের মধ্যেই) যুদ্ধের মোড় হঠাৎ ঘুরে যায় আর পারস্য রোমানদেরকে পরাভূত করে স্বল্পকালেই নিজেদের সমস্ত এলাকা পুনরুদ্ধার করে। এটি [মহানবী (সা.)-এর] হিজরতের পরের ঘটনা। হিজরতের পরেই রোমানরা বিজয় লাভ করে।

এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) তখনও মক্কাতেই অবস্থান করছিলেন, এ সময় আরবে এই সংবাদ প্রচারিত হয় যে, ইরানীরা রোমানদেরকে পরাজিত করেছে। এতে মক্কাবাসী খুবই উৎফুল্ল হয় (এই বলে যে,) আমরাও মুশরিক এবং ইরানীরাও মুশরিক। ইরানীদের রোমানদেরকে পরাভূত করা শুভলক্ষণ আর এর অর্থ দাঁড়ায়, মক্কাবাসীও মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করবে। (তারা এই শুভ লক্ষণ প্রকাশ পাবে বলে ধরে নেয়)। কিন্তু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

الم ﴿٢﴾ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴿٣﴾ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿٤﴾ فِي بِضْعِ سِنِينَ ۗ

(সূরা আর্ রূম: ২-৫)

রোমান সেনাবাহিনী সিরিয়ার অঞ্চলে নিঃসন্দেহে পরাভূত হয়েছে, কিন্তু এই পরাজয়কে তোমরা চূড়ান্ত পরাজয় মনে কর না, পরাভূত হওয়ার পর আগামী নয় বছরের মধ্যে বিজয় লাভ করবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ পেলে মক্কাবাসী মুসলমানদের নিয়ে অনেক বেশি হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রুপ করে এমনকি তাদের অনেকে হযরত আবু বকর (রা.)'র সাথে একশ' উট বাজি ধরে অর্থাৎ. এত বড় পরাজয় বরণের পরও যদি রোমানরা উন্নতি করতে সক্ষম হয় তাহলে আমরা

তোমাকে একশ' উট দিব। আর যদি এ ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত না হয় তাহলে তুমি আমাদেরকে একশ' উট দিবে। যদিও বাহ্যত এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া সুদূর পরাহত মনে হচ্ছিল। সিরিয়া পরাজয়ের পর রোমান সেনারা লাগাতার কয়েকটি পরাজয়ের কারণে পিছু হটতে থাকে, এমনকি ইরানী সেনাদল **মারমুরা** সমুদ্র উপকূলে পৌঁছে যায়। কন্সট্যান্টিনোপল নিজেদের এশিয়ান সাম্রাজ্য থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আর রোমানদের সুবিশাল সাম্রাজ্য কেবল একটি সামান্য রাজ্যের রূপ নেয়। কিন্তু খোদার বাণী পূর্ণ হওয়ার ছিল আর তা পূর্ণ হয়েছে। চরম হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় রোমান সম্রাট নিজের সৈন্যসামন্ত নিয়ে চূড়ান্ত আক্রমনের জন্য কন্সট্যান্টিনোপল থেকে রওয়ানা হয় এবং এশিয়ান উপকূলে অবতরণ করে ইরানীদের সাথে একটি চূড়ান্ত আক্রমন রচনা করে। সেনা ও সমরাস্ত্র কম থাকা সত্ত্বেও রোমানরা পবিত্র কুরআনের ভবিষ্যদ্ববাণী অনুযায়ী ইরানীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। আর ইরানী সেনাবাহিনী এমনভাবে পলায়ন করে যে, ইরানের সীমানার বাইরে তাদের অন্য কোথাও ঠাঁই হয় নি। এভাবেই আফ্রিকা ও এশিয়ার বিজিত দেশসমূহ পুনঃরায় রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে চলে আসে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, যখন আবু বকর (রা.) আবু জাহল এর সাথে বাজি ধরেন এবং পবিত্র কুরআনের সেই ভবিষ্যদ্বাণীটি অর্থাৎ,

الم ﴿٢﴾ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴿٣﴾ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿٤﴾ فِي بِضْعِ سِنِينَ ۗ

(সূরা আর্ রূমঃ ২-৫)

শর্তের ভিত্তি স্বরূপ উপস্থাপন করেন আর তিন বছরকাল সময় বেঁধে দেন তখন তিনি (সা.) ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকৃতি অনুসারে চটজলদি তাঁর দূরদর্শীতা প্রদর্শন করেন এবং আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে শর্ত কিছুটা সংশোধন করতে বলেন যে, بِضْعِ سِنِينَ -রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং এর ব্যাপ্তি হতে পারে সর্বোচ্চ নয় বছর।

অতঃপর রয়েছে গোত্রসমূহের সামনে মহানবী (সা.)-এর নিজেকে উপস্থাপন করা অর্থাৎ, নিজের দাবী উপস্থাপন করা আর হযরত আবু বকর (রা.)'র মহানবী (সা.)-কে সঙ্গ দেওয়ার বিষয়টি। যখন আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ধর্মকে জয়যুক্ত করতে চাইলেন এবং তাঁর নবীকে সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করতে চাইলেন আর নিজের অঙ্গীকার পূর্ণ করতে চাইলেন, তখন মহানবী (সা.) একবার হজ্জের মৌসুমে বাইরে বের হন এবং আনসার গোত্র অওস ও খাযরাজের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি হজ্জের মৌসুমে নিজের দাবি উপস্থাপন করেন, যেভাবে প্রত্যেক বছর হজ্জের মৌসুমে তিনি করতেন। একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আলী বিন আবী তালিব (রা.) বর্ণনা করেছেন, যখন আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবী (সা.)-কে নির্দেশ দেন, তিনি যেন আরবের জাতিসমূহের মাঝে নিজের দাবি বা নিজেকে উপস্থাপন করেন তখন আমি হযরত আবু বকর (রা.)'র সাথে মিনার উদ্দেশ্যে বের হই। একপর্যায়ে আমরা আরবদের এক সভায় উপস্থিত হই। হযরত আবু বকর (রা.) এগিয়ে যান আর যেহেতু তিনি বংশবৃক্ষ বা বংশতালিকা সম্পর্কে পারদর্শীতা রাখতেন তাই তিনি জিজ্ঞেস করেন, আপনারা কোন্ গোত্রের মানুষ? তারা উত্তর

দেয়, রবী'য়া গোত্রের। হযরত আবু বকর (রা.) জিজ্ঞেস করেন, রবী'য়ার কোন শাখার? তারা বলে, যাহল শাখার। হযরত আলী (রা.) বলেন, এরপর আমরা অওস ও খাযরাজের সভায় যাই, এরাই সেসব মানুষ যাদেরকে মহানবী (সা.) আনসার উপাধি দিয়েছিলেন কেননা, তারা তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন ও সাহায্য-সহযোগিতার অঙ্গীকার করেছিলেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, আমাদের সেখান থেকে ওঠার পূর্বেই তারা মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়আ'ত করেন।

অপর একটি রেওয়ায়েতে হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, যখন আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবী (সা.)-কে আরবের জাতি সমুহের সামনে নিজের দাবি উপস্থাপনের নির্দেশ দেন তখন তিনি (সা.) সে উদ্দেশ্যে বের হন। আমি ও আবু বকর (রা.)ও তাঁর সাথেই ছিলাম। আমরা একটি বৈঠকে গিয়ে উপস্থিত হই যেখানে শান্তি ও গাম্ভীর্য বিদ্যমান ছিল। এছাড়া তারা ক্ষমতাবান ও সম্মানিত ছিলেন। আবু বকর (রা.) তাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কোন গোত্রের মানুষ? তারা বলে, আমরা বনী শা'বান বিন সালাবাহ্ গোত্রের। হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে বলেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য নিবেদিত। এই জাতির মাঝে এদের চেয়ে বেশি সম্মানিত আর কোন মানুষ নাই। তাদের মাঝে ছিলেন মাফরূক বিন উমর, মুসান্না বিন হারেসাহ্, হানী বিন কাবিসাহ্ ও নো'মান বিন শরীক। মহানবী (সা.) তাদের সামনে এই আয়াত পাঠ করেন,

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ* (সূরা আল্ আন'আম : ১৫২)

এর অনুবাদ হল, তুমি বল, আস, আমি তা পড়ে শোনাই যা তোমাদের প্রভু তোমাদের ওপর হারাম করেছেন- তা হল এই যে, তোমরা তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না, এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা আবশ্যক করেছেন, এবং দারিদ্রের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদিগকে হত্যা করো না; আমরাই তোমাদেরকে রিয্ক দিয়ে থাকি এবং তাদেরকেও, এবং তোমরা কখনও অশ্লীলতার নিকট যেয়ো না, তা প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশ্য; এবং কোন এমন প্রাণকে হত্যা করো না যাকে (হত্যা করা) আল্লাহ্ হারাম করেছেন, কেবলমাত্র ন্যায়পন্থা ব্যতিরেকে। এটি সেই বিষয়, যার তাকিদপূর্ণ আদেশ তিনি তোমাদেরকে দিচ্ছেন যেন তোমরা বিবেক খাটাও। এটি শুনে মাফরূক বলে, এই বাণী পৃথিবীবাসীর নয়; যদি এটি তাঁর বাণী হতো তবে আমরা অবশ্যই তা জানতাম। এরপর মহানবী (সা.) এই আয়াত পাঠ করেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * (সূরা আন্ নাহ্লঃ ৯১)

অর্থাৎ, আল্লাহ্ নিশ্চয় ন্যায়বিচার ও দয়া এবং আত্মীয়সুলভ দানের আদেশ দিচ্ছেন এবং সর্বপ্রকার অশ্লীলতা ও মন্দকার্য এবং বিদ্রোহ করতে বারণ করছেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

এই বাণী শোনার পর মাফরূক বলে, হে কুরাইশ ভাই! আল্লাহ্র শপথ! আপনি উত্তম চারিত্রিক আদর্শ ও ভালো কাজের প্রতি আহ্বান করেছেন। নিঃসন্দেহে এমন জাতি কঠোর মিথ্যাবাদী যারা আপনাকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আপনার বিরুদ্ধে পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। মুসান্না বলে, হে আমার কুরাইশ ভাই! আমরা আপনার কথা শুনেছি। আপনি সর্বোত্তম কথা বলেছেন এবং আপনি যেসব কথা বলেছেন, সেগুলো আমাকে অবাক করেছে। কিন্তু কিসরার সাথে আমাদের একটি চুক্তি রয়েছে যে, না আমরা কোন নতুন কাজ করব আর না কোন নতুন কাজ সম্পাদনকারীকে আমরা আশ্রয় দেব। আর সম্ভবত আপনি আমাদেরকে যে কাজের প্রতি আহ্বান করছেন তা সেই কাজের অন্তর্ভুক্ত যা স্বয়ং বাদশাহ্ও অপছন্দ করেন। যদি আপনি এটি চান যে, আরবের চতুর্দিকের লোকজনের মোকাবিলায় আমরা আপনাকে সাহায্য করি ও আপনার সুরক্ষা করি তাহলে আমরা এমনটি করব। তখন মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদের উত্তরে কোন দোষ নেই, কেননা তোমরা সুস্পষ্টভাবে সত্য কথা বলেছ। আল্লাহ্'র ধর্মের ওপর সে-ই প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে যাকে আল্লাহ্ তা'লা সকল দিক হতে পরিবেষ্টন করে রাখেন। অতঃপর মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র হাত ধরেন এবং উঠে রওয়ানা হন।

অপর এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, তিনি (সা.) বলেন, তোমরা কি মনে কর? যদি স্বল্প সময়ের মধ্যে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে কিসরার ভূমি ও দেশের উত্তরাধিকারী করেন এবং তাদের নারীদেরকে তোমাদের অধীনস্ত করেন, তবে কি তোমরা আল্লাহ্'র পবিত্রতা ও প্রশংসা কীর্তন করবে? এটি শুনে সে বলে, হে আল্লাহ্! আমরা প্রস্তুত আছি। অর্থাৎ তারা শপথ করে। খোদা তা'লার মহিমা দেখুন! এই কথা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে আর সেই মুসান্না, যে সে সময় কিসরার ক্ষমতার কারণে এত ত্রস্ত ছিলেন যে, তার অসন্তুষ্টির ভয়ে ইসলাম গ্রহণে ইতস্তত করছিলেন, কিছুকাল পর হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালে সেই কিসরার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ইসলামী সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি এই মুসান্না বিন হারেসা-ই ছিলেন যিনি কিসরা বাহিনীর কোমর ভেঙ্গে দিয়েছিলেন এবং মহানবী (সা.)-এর সুসংবাদের সত্যায়নকারী বা সত্যায়নস্থলে পরিণত হয়েছিলেন।

অনুরূপভাবে অপর এক হজ্জের সময়কার রেওয়ায়েত হল, যখন বকর বিন ওয়ায়েল গোত্র হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় আসে তখন মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, আপনি তাদের কাছে যান এবং তাদের সামনে আমাকে উপস্থাপন করুন অর্থাৎ, তাদেরকে তবলীগ করুন, আমার দাবি উপস্থাপন করুন। হযরত আবু বকর (রা.) তাদের নিকট গিয়ে মহানবী (সা.)-কে তাদের সামনে উপস্থাপন করেন। এরপর মহানবী (সা.) তাদের কাছে ইসলামের তবলীগ করেন। বাকি আলোচনা ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতে করা হবে।

আজ আমি আফগানিস্তানের আহমদীদের জন্য দোয়ার আবেদন করছি। বহু কষ্টের মধ্যে দিয়ে (তারা) দিন পার করছেন। বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। তাদের বাড়ির মহিলা ও শিশুরা উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে। যেসব পুরুষ গ্রেফতার হয় নি, তারা গ্রেফতার হওয়ার ভয়ে বাড়িছাড়া। আল্লাহ্ তাদের জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করুন এবং তাদেরকে এই সমস্যা থেকে মুক্ত করুন।

পাকিস্তানের আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন। সাধারণভাবে সেখানেও অবস্থা খারাপই থাকে। কোথাও না কোথাও কোন না কোন ঘটনা ঘটতেই থাকে, যেখানে লোকেরা আহমদীদের কষ্ট দিয়ে যাচ্ছে। অনুরূপভাবে মোটের ওপর দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন জগদ্বাসীকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে চেনার তৌফিক দান করেন এবং সকল অনিষ্টের মূল উৎপাটন করেন আর বিশ্ববাসী যেন তাদের সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে সক্ষম হয়।

এরপর আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব আর পরে তাদের গায়েবানা জানাযা পড়াব। (তাদের মধ্যে) প্রথম স্মৃতিচারণ আলহাজ্ব আব্দুর রহমান আয়নন সাহেবের। তিনি ঘানা জামা'তের সাবেক সেক্রেটারী উমুরে আম্মা ও অফিসার জলসা সালানা ছিলেন। ঘানিয়ান ছিলেন, ৮১ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার পিতামাতা উভয়েই আহমদী ছিলেন, অর্থাৎ, তার পিতামাতা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মিশর থেকে উচ্চাশিক্ষা অর্জন করেন আর মিশর থেকে উচ্চশিক্ষা অর্জনের পর তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। ঘানাতে ফিরে এসে এখানে বড় বড় কোম্পানীতে ম্যানেজার পদে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি নাইজেরিয়াতেও কিছুদিন কাজ করেছেন আর পরে নিজেই কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন, যার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছিলেন তিনি। অত্যন্ত পুণ্যবান ও নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। তিনি জামা'তের অনুকরণীয় সেবা করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। সারাজীবন তিনি জামা'তের স্বার্থ ও কাজকে নিজস্ব কাজের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন, বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত থেকে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করতে থাকেন। সব সময় জামা'তের আমীরের আনুগত্য করা এবং সকল ডাকে সাড়া দেয়াকে নিজের সৌভাগ্য মনে করতেন। প্রায় সময় সকালে মিশন হাউজে এসে আমীর সাহেবের কাছ থেকে জেনে নিতেন আর যদি কোন জামা'তী কাজ থাকত তাহলে তা আগে শেষ করতেন এবং এরপর তিনি নিজের কাজে যেতেন। দীর্ঘদিন তিনি বৃহত্তর আকরা অঞ্চলের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৭৯ থেকে ১৯৯৮ সন পর্যন্ত তিনি মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র সদর ছিলেন আর এরপর দীর্ঘকাল তিনি সেক্রেটারী উমুরে আম্মা হিসেবে কাজ করেন, এছাড়া অফিসার জলসা সালানা হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন। মৃত্যুকালে তিনি ন্যাশনাল ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। যে কারও সেবা করার জন্য তিনি সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন, অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। সহানুভূতি কেবল নিজ পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং তার বদান্যতা বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন ছাড়াও জামা'তের বিভিন্ন সদস্য এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের ঊর্ধ্বে থেকে পাড়ার লোকদের পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জামা'তের প্রতি বিশ্বস্ত এবং খিলাফতের জন্য নিবেদিতপ্রাণ সৈনিক ছিলেন। জামা'তের স্বার্থকে অন্য সবকিছুর ওপর প্রধান্য দিতেন আর

কখনোই কোন বিরোধীর তোয়াক্কা করেন নি। তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত ছিলেন এবং নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন আর সফরে ও গৃহে থাকা অবস্থায় এর ওপর আমল করতেন। ওসীয়্যতকারী ছিলেন এবং নিয়মিত চাঁদা প্রদান করতেন। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও ৫জন পুত্র ও ৫জন কন্যা রেখে গেছেন। ঘানার মুরব্বী হাফিয মুবাশ্বের আহমদ লিখেন, তিনি খুবই বিচক্ষণ ছিলেন আর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও যৌক্তিক কথা বলতেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়ের গভীরে পৌঁছে যেতেন। তিনি বলেন, একবার বোর্ড মিটিং-এর সময় সবাই যার যার মত মতামত ব্যক্ত করছিল। একটি বিষয় ছিল যা প্রলম্বিত করা হচ্ছিল, তিনি নীরবে শুনছিলেন কিন্তু তার পালা এলে তিনি বলেন, এ সম্পর্কে যুগ খলীফার পক্ষ থেকে একটি সিদ্ধান্ত এসে গেছে, তাই আমাদের বিতর্ক করার কোন প্রয়োজনই নেই। কেননা, যুগ খলীফার পক্ষ থেকে কোন সিদ্ধান্ত এসে গেলে এরপর আর কোন মন্তব্য করা ঠিক না বরং আমাদের উচিত অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করা। দূর-দূরান্তের অঞ্চলগুলোতেও আল্লাহ্ তা'লা এ ধরণের নিষ্ঠাবান লোক দান করে রেখেছেন।

এরপর আযইয়াব আলী মুহাম্মদ আল্ জাবালী সাহেবের স্মৃতিচারণ করব। কিছুদিন পূর্বে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি জর্ডান জামা'তের সদস্য ছিলেন। জর্ডান জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব লিখেন, তিনি ২০১০ সনে বয়'আত করেছিলেন। নিজের অঞ্চলে একা আহমদী ছিলেন আর সেখানকার রীতিনীতি অনুসারে যেহেতু স্বামীর সাথে তার স্ত্রীও তার ধর্মের অনুসারী হয়ে যায় তাই তিনিও আহমদী হয়ে যান। তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), আহমদীয়াত এবং খিলাফতের প্রতি মরহুমের ঈমান পাহাড়ের মত সুদৃঢ় ছিল। আহমদীয়াত গ্রহণের ফলে পরিবার এবং অন্য বিরোধীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও মরহুম দৃঢ়তার এক অনন্য দৃষ্টান্ত ছিলেন। তিনি আহমদীয়াত ও খিলাফতের জন্য গভীর আত্মাভিমান রাখতেন এবং খুবই জোরালোভাবে প্রতিবাদ করতেন। জ্ঞান অর্জন এবং তবলীগ করার তার খুবই আগ্রহ ছিল। অনেক সময় গভীর রাতে ফোন করে বিভিন্ন মসলা-মাসায়েল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। এভাবে তার বাড়িতে বিরোধী এবং আত্মীয়দের সাথে বেশ কয়েকটি তবলীগি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মরহুম বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত ছিলেন এবং এজন্য অনেক বেশি কষ্টে ছিলেন আর এ রোগই আসলে প্রাণঘাতি ছিল। তার কোন কোন আত্মীয় তাকে এই অসুস্থতার সময় বলত, আহমদীয়াতের জন্যই তোমার এ অবস্থা হয়েছে, তুমি আহমদীয়াত ছেড়ে দাও তাহলে আমরা তোমার পক্ষে কিয়ামত দিবসে সাক্ষ্য দিব। এমতাবস্থায় তিনি অত্যন্ত আবেগের সাথে দোয়া করেন যে, **হে খোদা! তুমি আমাকে আহমদী মুসলমান অবস্থায়ই মৃত্যু দিও**।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হবে অবসরপ্রাপ্ত মুরব্বী জনাব দ্বীন মুহাম্মদ শাহেদ সাহেবের। বর্তমানে তিনি কানাডায় ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ৯২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার পরিবারে আহমদীয়াত তার পিতার মাধ্যমে এসেছে, যিনি ১৯৩৮ সনে বয়'আত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৪০ সনে তার পিতা তাকে সাথে করে কাদিয়ান জলসায় নিয়ে যান, যেখানে তার শ্রদ্ধেয় পিতা কাদিয়ানের শিক্ষা এবং ধর্মীয় পরিবেশ দেখে প্রভাবিত হন আর

তারও আগ্রহ ছিল পড়াশোনা করার। এটি দেখে তাকে কাদিয়ানেই এগারো বছর বয়সে হযরত মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব (রা.)'র তত্ত্বাবধানে রেখে আসেন আর সেখানেই তিনি পড়াশোনা করেন। ১৯৫৩ সনে তিনি জামেয়া থেকে শাহেদ ডিগ্রী অর্জন করেন। পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে তিনি মুরব্বী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিন-চার বছর তিনি ফিজি দ্বীপপুঞ্জে মিশনারী ইনচার্জ হিসেবেও দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছেন। রাবওয়াতে সুদীর্ঘ দিন প্রেস সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালনেরও সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি চারটি পুস্তক রচনা করার পাশাপাশি অসংখ্য জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করে গেছেন। তবলীগের উম্মাদনা ছিল তাঁর মাঝে। (এজন্য) তিনি নিত্যনতুন পন্থা অবলম্বন করতেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও তিনি দু'জন পুত্র এবং তিনজন কন্যা রেখে গেছেন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ জনাব মিয়াঁ রফিক আহমদ সাহেবের, যিনি জলসা সালানা দপ্তরের একজন কর্মী ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ৮৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার পিতার নাম ছিল মরহুম বশীর আহমদ সাহেব। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বেই তিনি কাদিয়ান থেকে কোয়েটায় হিজরত করেছেন এবং তার পিতা কোয়েটা জামা'তের আমীর হিসেবে (দায়িত্বপালনের) সৌভাগ্য লাভ করেন। মিয়াঁ রফিক সাহেবের পরিবারে আহমদীয়াতের সূচনা হয় তার পিতামহ, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত ডাঃ আব্দুল্লাহ্ সাহেবের মাধ্যমে। ১৯৬০ সনে মিয়াঁ রফিক সাহেব লাহোরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বিএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত থাকেন, এরপর তাঞ্জানিয়া চলে যান। প্রায় দশ বছর তাঞ্জানিয়ায় অতিবাহিত করেন। এরপর কিছুদিন সেখানে একটি কোম্পানীতে চাকরির পাশাপাশি শিক্ষকতাও করেন। তাঞ্জানিয়াতেও তিনি সেক্রেটারী মাল হিসেবে (জামাতের) সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৮৬ সনে তিনি ওয়াক্‌ফে আরযী হিসেবে জলসা সালানা দপ্তরে সেবা করতে আরম্ভ করেন এবং পরবর্তীতে ১৯৮৭ সালে জলসা সালানা দপ্তরের নিয়মিত কর্মী হিসেবে কাজ আরম্ভ করেন। পরবর্তীতে ১৯৮৯ সালে জীবন উৎসর্গ করে রাবওয়ার জলসা সালানা দপ্তরের টেকনিক্যাল বিভাগে টেকনিক্যাল বিষয়াদির নাযেম হিসেবে সেবা আরম্ভ করেন এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এই দায়িত্বেই বহাল ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাকে বিয়ে করিয়েছিলেন এবং হযরত মওলানা আবুল আতা সাহেব তার বিয়ে পড়িয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে তিনজন পুত্র ও এক কন্যা দান করেছেন। তার পুত্র বলেন, যদি জামা'তের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কখনও কোথাও কোন ভুল কথা বলা হতো তবে সাথে সাথে বাধা দিতেন এবং নিষেধ করতেন। খিলাফতের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ছিল। একবার বাড়ির কোন সদস্য বা বাড়িতে আগত কোন অতিথি বলেন, আপনি জামা'তের পক্ষ থেকে যে কোয়ার্টার পেয়েছেন তা খুবই ছোট; আপনি বললে আপনি বড় কোয়ার্টার পেতে পারেন। তিনি বলেন, জামা'ত যদি আমাকে তাঁবুতেও থাকতে দেয় তবে আমি সেখানেই থাকতে প্রস্তুত; আমি কোন দাবি করব না। তার পুত্র আরো লিখেন, বাবার মৃত্যুর পর আমরা তার এই গুণ সম্পর্কে জানতে পেরেছি যে, কিছু দরিদ্র মানুষকে তিনি গোপনে

সাহায্য করতেন। তার ছোট ছেলে বলেন, তিনি তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন, কুরআন শরীফের প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন, কোমল হৃদয়ের অধিকারী, আন্তরিক ব্যবহার, ঈমানদার, সত্যবাদীতাসহ অসংখ্য উন্নত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। বাবার মাঝে যুগ-খলীফার আনুগত্য এবং খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ততা ও ওয়াক্‌ফের অঙ্গীকার পালনের অসাধারণ স্পৃহা ছিল। (হুযূর বলেন,) আমিও তার মাঝে এটি দেখেছি, অত্যন্ত ভদ্র মানুষ ছিলেন, পরম বিনয়ের সাথে প্রতিটি কাজ করতেন এবং নিষ্ঠার সাথে নিজের বয়'আতের দায়িত্ব পালনকারী ছিলেন। অনুরূপভাবে তিনি এ বিষয়েও সচেষ্ট থাকতেন যে, জামা'তের অর্থ কীভাবে সাশ্রয় করা যায় এবং কীভাবে স্বল্পতম ব্যয়ের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হওয়া যায়। রাবওয়ায় তিনি রুটি বানানোর কিছু মেশিনও ডিজাইন করেন এবং এর জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। তিনি (তার ছোট ছেলে) আরো লিখেন, দুঃখকষ্ট বা দুশ্চিন্তার সময় আমি সর্বদা তার মাঝে ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল প্রত্যক্ষ করেছি। দুঃখকষ্ট বা দুশ্চিন্তার সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি তাকে পবিত্র কুরআন পড়তে দেখেছি। অসুস্থতার সময় এবং মৃত্যুর পূর্বেও তিনি বিন্দুমাত্র কষ্টের বহিঃপ্রকাশ করেন নি। প্রতিটি কাজ খুব ঈমানদারী ও আবেগের সাথে করতেন। এটি আগেও উল্লেখ করা হয়েছে।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হল, আমেরিকা জামা'তের সাবেক আমীর এহ্‌সানুল্লাহ্ জাফর সাহেবের সহধর্মিণী শ্রদ্ধেয়া কানেতা জাফর সাহেবার। সম্প্রতি এক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ১৯৪১ সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অবসরপ্রাপ্ত সেশন জজ চৌধুরী আযম আলী সাহেব তার পিতা ছিলেন। তারা নানা ছিলেন চৌধুরী ফকীর মুহাম্মদ সাহেব যিনি দেশবিভাগের অব্যবহিত পরে নাযের উমুরে আম্মা হিসেবে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি অজস্র গুণের অধিকারী ছিলেন এবং খুবই প্রসন্ন একজন মহিলা ছিলেন। খিলাফতের সাথে সর্বদা বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল আর খুব ভালোভাবে তিনি তা প্রকাশও করেছেন। পবিত্র কুরআনের প্রতি মরহুমার গভীর ভালোবাসা ছিল। মহানবী (সা.) ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি তার গভীর আন্তরিকতা ছিল। নিজের সন্তানদের মাঝেও (তিনি) এই ভালোবাসা ও আন্তরিকতা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্বামী ছাড়াও দু'জন কন্যা রয়েছেন। তার একজন যুবক পুত্র ছিল যিনি কয়েক বছর পূর্বে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে। অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে তিনি এই কষ্ট সহ্য করেছেন।

অস্ট্রেলিয়ার মুরব্বী এনামুল হক কাওসার সাহেব লিখেন, আমি যখন আমেরিকাতে ছিলাম তখন তিনি অনেক দূর থেকে নিয়মিত কুরআন ক্লাসে অংশ নিতেন। তিনি পিএইচডি ডক্টর ছিলেন কিন্তু খুবই সাদাসিধা মানুষ ছিলেন। তার মধ্যে কোনো ধরণের দাম্ভিকতা বা লোকদেখানো ভাব ছিল না। দরিদ্র ও অভাবীদের প্রতি খুবই যত্নবান ছিলেন। মুবাল্লিগদের প্রতি একজন মমতাময়ী মায়ের মতো আচরণ করতেন এবং তাদের সাথে খুবই সম্মানজনক ব্যবহার করতেন। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সব কাজ করতেন। অধিকাংশ সময় লাজনাদের বলতেন, জুতা রাখার জায়গায় জুতা রাখবেন আর যারা রাখত না (তাদের জুতাগুলো) তিনি নিজে উঠিয়ে রাখার কাজও করতেন। এছাড়া মসজিদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজও অত্যন্ত বিনয়ের সাথে করতেন।

তিনি বলেন, তার মাঝে কোন ধরণের দাম্ভিকতা বা লোকদেখানো ভাব ছিল না। খুবই সাদাসিধা পোশাক পড়তেন, উত্তম ব্যবহার করতেন। কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হতেন না। সবার সাথে উত্তম আচরণ করতেন। খিলাফতের পক্ষ থেকে জারিকৃত সকল তাহরীকে অংশগ্রহণ করতেন।

আল্লাহ্ তা'লা সকল প্রয়াতের প্রতি ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন, তাদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তাদের বংশধরদেরকেও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণের তৌফিক দিন।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)